৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ঃ তাত্ত্বিকতা, বাস্তবতা ও প্রাসঙ্গিকতা

অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স (বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যাণ) ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেদিনে মঞ্চে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন, আর বক্তা ছিলেন মাত্র একজন-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সভার সভাপতি কে ছিলেন তা জানার প্রয়োজন বোধ করিনি। সভাটি শুরুর আগে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাঙালা দেশ স্বাধীন কর, তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার নেতা আমার নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব' স্লোগানে মুহর্মূহু উচ্চারিত হচ্ছিল। বক্তৃতা শুরুর সাথে সাথে সারা ময়দানের কমপক্ষে দশ লাখ শ্রোতার মাঝে পিন-পতন নিস্তব্দতা নেমে আসে। 'ভাইয়েরা আমার' বলে তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন এবং জানালেন 'আজ অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত হয়েছি'। তারপর শ্রোতাকে উৎকর্ণ করার মানসে বললেন, 'আজ দুঃখের সাথে বলতে হয় ২৩ বছরের করুন ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের ইতিহাস, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস, ২৩ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।' বক্তার ও বিষয়বস্তুর বিশ্বাসযোগ্যতায় বিমোহিত শ্রোতা উজ্জীবিত ও উৎকর্ণ হয়ে তার ১৮/১৯ মিনিটের ভাষণটি শুনলেন। শুধু শুনলেন না, অখন্ড মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। আকাশে যুদ্ধ বিমানের আনাগোনা কিংবা একটি হেলিকপ্টারের চক্রাকার আবর্তন শ্রোতাদের মনোযোগে বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটেছিল বলে মনে পড়ছে না। বক্তব্য শেষে বহু স্লোগান উচ্চারিত হয়েছে এবং মনে হলো লক্ষ লক্ষ শ্রোতা তাদের কাম্য বস্তুটি হাতে পেয়ে তৃপ্ত মনে ঘরে ফিরে যাচ্ছে।

সেদিন আমার মতো লাখো লাখো শ্রোতার কাম্য ছিল একটা ঘোষণা এবং সে ঘোষণাকে বাস্তবায়নের রণ-কৌশল। বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে শুনালেন স্বাধীনতার অমর কাব্যের একাংশ 'এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। কার্যত: এই বাক্যটিই ছিল স্বাধীনতার প্রচ্ছন্ন ঘোষণা এবং তারপরই শত্রু পক্ষের কামান গর্জে উঠার কথা ছিল। তা হলো না, কেননা শ্রদ্ধেয় বক্তা একটু রেশ টেনে ধরলেন। আরও একটু কৌশলী পথ ধরলেন।

সভাস্থলে আসার পূর্বে সহকর্মী, উদ্ধত ছাত্র ও যুব নেতাদের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তিনি স্বর ও সুরে নমনীয়তা যোগ করে চারটি দাবি উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন, 'সামরিক আইন মার্শাল ল, উইথ-ড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে'। বস্তুত: সংসদ অধিবেশন স্থগিতের পর এটাই ছিল বিশ্ব বিবেকের সাথে সংগতিময় আহ্বান। অপর দিকে এটা যে স্বাধীনতা অর্জনের অন্যতম নিয়মতান্ত্রিক কৌশল ছিল এবং থাকতে পারত তা কিছুটা হলেও তিনি দৃষ্টি সীমায় রাখলেন। সেই ১৯৪৭ সাল থেকেই শেখ মুজিব স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। কখনও তিনি সে লক্ষ্যচ্যুত হননি। তবে কৌশলের ব্যাপারে তার বিকল্প চিন্তা ছিল। একটা ছিল নিয়মতান্ত্রিক যার উৎকৃষ্ট প্রকাশ ঘটে ৬ দফার কর্মসূচিতে। ৭ই মার্চ ভাষণে উত্থাপিত শর্তাবলী যদি পাকিস্তানের শাসকরা মেনে নিত তাহলে ক্ষমতায় বসেই ৬ দফা ভিত্তিক নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তিনি স্বাধীনতা আনতে পারতেন। তিনি জানতেন পাকিস্তান তাও মেনে নেবে না। তাই সুস্পষ্ট অসহযোগের ঘোষণা দিলেন। তিনি বললেন, 'আজ থেকে এই বাংলাদেশের কোর্টকাচারি, আদালত-ফৌজদারি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে'। কিংবা 'যে পর্যন্ত আমার দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হল- কেউ দেবে না'।

তিনি রক্তপাতের কথা প্রথম থেকেই উচ্চারণ করলেন, শ্রোতাদের বুঝাতে চাইলেন যে রক্তের মতো চরম মূল্য দিয়েই মুক্তি ও স্বাধীনতা আনতে হবে। রণ-কৌশলের পুনরাবৃত্তি ও সম্পূরক রণ-কৌশলের কথাও বললেন, 'আমরা ভাতে মারবো, পানিতে মারবো'। 'এ বাংলার হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, বাঙালি, অবাঙালির সমন্বেলে তিনি হন্তারক সেনা-সদস্যেরও ভাই বলে সম্বোধন করলেন। সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে থাকার নির্দেশনা দিলেন; সুর আরও কোমল করে বললেন, 'তোমরা আমাদের ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, তোমাদের কেউ কিছু বলবে না'। পরের বাক্যটি হলো 'কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না, ভালো হবে না'। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ঘোষণা দিলেন, 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারব না, আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না'। সতীর্থদের নির্দেশ দিলেন, 'তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো'। 'প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, প্রত্যেক ইউনিয়নে, প্রত্যেক সাব-ডিভিশনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো'।

রক্তের প্রসঙ্গ আবার তুললেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব, বাংলার মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব'-ইনশাল্লাহ। এবং আসল কথাটিতে 'আমার' বদলে 'আমাদের' শব্দটি যোগ করে বললেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এখানেই স্পষ্ট হলো যে যদিও সেদিনে তিনি সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি, তবুও

মহান স্রষ্টা তার মুখ দিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণাটিই নিঃসৃত করে দিলেন যা লাখো লাখো শ্রোতার কাম্য ছিল। বহু পরে পাকিস্তানি গোয়েন্দার ভাষ্যে জেনেছি যে, 'শেখ মুজিব আমাদের নাকের ডগায়, চোখের সামনে স্বাধীনতার ঘোষণাই দিয়ে গেলেন। আমরা কিছু করতে পারলাম না'। তাই তাত্ত্বিকভাবে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাঙালির স্বাধীনতা ঘোষণার দিন।

তবে ৭ মার্চের জনসভায় আসার আগেই এটুকুও জানতাম যে বঙ্গবন্ধু সকলের আকাঙ্ক্ষাকেই বাঙ্ময় করে তুলবেন। আমি ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখেই জেনেছিলাম নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সংগ্রামের দিন শেষ। সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। ২৮ তারিখে সকাল ৯টার প্রায় ঘন্টা খানেকের জন্যে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের সাথে বঙ্গবন্ধু আলোচনায় বসেছিলেন। দুপুরের পর শেখ ফজলুল হক মনির সাথী হয়ে আমি আওয়ামী লীগ অফিসে গিয়ে তা জানতে পারলাম। আশ্বস্ত হবার মতো কথা শুনলাম যে বিনা রক্তপাতে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হতে পারে। আমাদের আলোচনার মাঝ পথেই ফারল্যান্ড বঙ্গবন্ধুকে টেলিফোন করলেন। ঈঙ্গিত পেয়ে আমরা বাইরে চলে গেলাম। কয়েক মিনিট পর বঙ্গবন্ধু আমাদের ডেকে নিয়ে বললেন যে 'যদি ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ কোন বিবৃতি কিংবা ভাষণের মাধ্যমে ৩ মার্চের সংসদ অধিবেশন বন্ধ করে দেয়, তাহলে রক্তপাত ছাড়া অন্য কোন উপায়ে স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে না'। ১ মার্চ তারিখে ইয়াহিয়া ভাষণ নয়, একটি বিবৃতির মাধ্যমে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সংসদ অধিবেশন বন্ধ করে দিল। বাইরের কাছে বিবৃতিটি ছিল একটি সামান্য ঘটনা। ২৩ বছরের আগুনে জ্বলা বাঙালির কাছে তা ছিল জীবন মরণ সমস্যা যার সমাধান উত্তরোত্তর রক্তদানের মধ্যে নিহিত। ৭ মার্চের ভাষণে বার বার যখন তিনি রক্তদানের কথা বলেছিলেন তখন আমার মনে হচ্ছিল যুদ্ধ আসন্ন ও রক্তদান অলঙ্ঘনীয়। কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণার সাথে সাথে যুদ্ধের কৌশলও ঘোষিত হলো। উপস্থিত লাখো লাখো জনতা এটাকেই স্বাধীনতার ডাক ও যুদ্ধের আহ্বান ধরে দৃপ্ত পদে ও তৃপ্ত মনে ফেরার পথ ধরল। মনে হলো তারা গন্তব্য ও পথের নির্দেশনা পেয়ে গেছেন। তবে প্রতিঘাতের দিনক্ষণ নির্ধারিত হলো এভাবে 'আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের উপর হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল তোমরা প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু, আমি যুদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে'।

ভাষণের পর দেন-দরবারের মধ্যে ১৮ দিন চলে গেল আর আনুষ্ঠানিক ঘোষণার লগ্নটি এসে গেল। মোক্ষম লগ্ন এলো ২৫ মার্চ রাতে যেদিন একটি গুলি দিয়ে একজন মানুষকে নয়, হাজারে হাজারে মানুষকে লাখো লাখো গুলির আঘাতে প্রাণে মারা হলো। আমাদের সৌভাগ্য এই প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিলেন। প্রতিরোধ যুদ্ধ থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরিটা পেছনে ফেলে রেখে যুদ্ধে জড়িয়ে গেলাম। যুদ্ধটা কাম্য ছিল না কিন্তু আমাদের যুদ্ধ ছাড়া বিকল্প ছিল না। যুদ্ধকালে প্রতিনিয়ত বঙ্গবন্ধুর আহ্বানটি কানে বাজতে থাকত 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'। নয় মাস তার এই ভাষণটি আমাদেরকে বার বার বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি মনে করিয়ে দিয়েছে, উদ্দীপ্ত করেছে। ট্রেনিং এর আগে ট্রেনিং এর সময়ে এবং যুদ্ধকালে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমরা নিজেরা তা শুনেছি, নিবেদিত যোদ্ধাদের শুনেয়েছি যারা অকাতরে নির্দ্ধিধায় মৃত্যু উপত্যকায় প্রতিযোগিতায় নেমে জয়ী হয়েছে।

যুদ্ধকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কিংবা অন্যান্য পত্র-পত্রিকা মারফত তার ভাষণের বাণী নির্দেশনা হয়ে আমাদের সজ্জীবিত রেখেছে, গন্তব্যে উপনীত হবার পাথেয় দিয়েছে। যুদ্ধ পরিচালনার বাইরে সাপ্তাহিক 'বাংলাদেশ' পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক ও কলাম লেখকের খণ্ডকালীন দায়িত্বে ছিলাম। যতটা সম্ভব ৭ই মার্চের ভাষণকে মৃতঃসজ্জীবনী হিসেবে উপস্থাপনের প্রয়াস ছিল। এ ভাষণে একটি নন-মার্শাল জাতিকে মার্শাল জাতিতে রূপান্তর, একটি দ্বিধান্বিত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন জাতিকে একত্রিত ও সমন্বিত করার উপাদান ছিল। এ ভাষণ সর্বাধিনায়ককে যোদ্ধার সামনে সারাক্ষণ উপস্থিত রেখেছে। বঙ্গবন্ধুকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অহিংসবাদী ও মানবিক নেতা হিসেবে পরিচয় করিয়েছে। তাকে রাজনীতির কবি হিসেবে অভিষিক্ত করেছে।

বহু বছর পর ইউনেস্কো ভাষণটিকে বিশ্ব-মানুষের যৌথ সম্পদের মর্যাদা দিয়েছে। বাংলাদেশ সরকারও ভাষণটিকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছে। ভাষণটির প্রণেতা ও বক্তা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন। এখন প্রয়োজন হলো ভাষণটিকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণের জায়গায় নিয়ে আসা।

ভাষণটির শব্দ চয়ন ও বাক্য বিন্যাসে যে বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও বাস্তবতার স্পর্শ ছিল, তা এখন খুঁজে পাই। বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের বিচ্ছিন্নতা বিরোধী আন্তর্জাতিক আইনের সাথে পরিচিত ছিলেন। নাইজেরিয়ায় বায়োফ্রার পরিণতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন, বিশ্বমোড়লদের মতি গতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, বিশ্ব জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, ভারতের সাধারণ নির্বাচন নিয়ে অস্বস্তি ও অনিশ্চয়তাতে ছিলেন। ১ থেকে ১০ মার্চ পর্যন্ত ভারতের সাধারন নির্বাচন চলছিল। ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন নিয়ে গৃহ বিবাদ ছিল, অনিশ্চয়তা ছিল। তাই অপেক্ষার প্রয়োজন ছিল। ৮ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত দেন-দরবার, দর কষাকষি, মন কষাকষি, হুমকি-ধমকির ও রক্তগঙ্গার সম্ভাবনার মধ্যে তিনি প্রস্তুতির সুযোগ নিয়েছিলেন।

বিশ্ব জনমত মোটামুটি অনুকূলে আনতে পেরেছিলেন। দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করলেন, সংঘবদ্ধ করলেন, আর প্রতিঘাতের অপেক্ষায় রইলেন। ২৬ মার্চে যখন তিনি স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিলেন তখন সেটাকে কেউ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার কিংবা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বা একক স্বাধীনতা ঘোষণা বলতেও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেনি। যুদ্ধ চলল। সারা দেশ সম্পৃক্ত হলো। নিজের প্রয়াস ও মিত্রদের সহায়তা আমরা স্বাধীন ও সার্বভৌম হলাম।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে আমাদের রাজনৈতিক লড়াই সমাপ্ত হয়েছে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির লড়াই চলছে, হয়ত অনন্তকাল চলবে। তাতে বাধা আসবে, বিপত্তি আসবে আর সে সব উত্তরণে জন্ম-জন্মান্তরে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে এই ভাষণটি থাকবে। শুধু দেশে না, পৃথিবীর যে কোনো স্থানে মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামে ভাষণটি প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবে। আমাদের এই মহা-মূল্যবান সম্পদটি যথোপযুক্ত সংরক্ষণ করতে হবে, তার আন্তর্নিহিত বাণী, ভাব, ভাষা ও দ্যোতনাকে সম্প্রসারিত করতে হবে। ভাষণ স্থলসহ অন্যান্য পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক। আরও প্রয়োজন হচ্ছে এই ভাষণ ধারণ, বাহন, সংরক্ষণ, ঝুঁকিময় পরিবহণ ও যথাস্থানে সমর্পণের কাজে নিয়োজিত সকলের প্রাপ্য স্বীকৃতি দান।

এই ভাষণের নিকটতম উদ্দেশ্যসমূহ প্রায় সবই অর্জিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিকতা বিচারে এই ভাষণের উদ্দেশ্যে ছিল মুক্তি ও স্বাধীনতার ব্যাপারে বাঙালিকে পুনঃজাগ্রত করা, গোষ্ঠীভুক্ত করা আর ব্যাপক সম্পৃক্ততা দিয়ে তাদেরকে আত্ম-ত্যাগের বাসনায় উন্মাদ ও উদ্বুদ্ধ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করা এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। আমাাদের স্বাধীনতা এসেছে কিন্তু মুক্তি এখনও বহু দূরে। মুক্তি বলতে বঙ্গবন্ধু যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি বুঝিয়েছেন তাও ভাষণে অনুল্লেখ ছিল না। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ তাই আমাদেরকে জন্ম থেকে জন্মান্তরে দুঃসাধ্য অর্জনে উৎসাহিত করছে ও করবে।

লেখক : বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শিক্ষাবিদ।